Issue cover not available

Vol. 13 | No. 1 | 1969

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাউল-গানে "বর্জখ" শব্দের অর্থ-নির্ণয়

Volume	13
Issue	1
Year	1969
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	হরেন্দ্র চন্দ্র পাল
Published online	June 1, 1969
DOI	10.62328/sp.v13i1.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v13i1.5
Pages	178-189
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বাউল-গানে "বর্জখ" শব্দের অর্থ-নির্ণয়

হরেন্দ্র চন্দ্র পাল

'বর্জখ' বা 'বরজোক' শব্দের ব্যবহার বাঙলা সাহিত্যের বাউল গানে বিশেষ দৃষ্ট হয়। হিদু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙলার সুফী বা মরমিয়া কবিগণ এ শব্দটি বিশেষ অর্থে তথায় ব্যবহার করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে গুরু (পীর, মুর্শিদ) বা গুরুর প্রতীক অর্থে ব্যবহার হলেও, 'বর্জখ' শব্দটি প্রকৃতপক্ষে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন, লালন (বা ফকির লালন শা) বলেন,

"আইন কল্লেন জগৎ-জোড়া—
সেজদা[১] হারাম[২] খোদা ছাড়া,
মুরশিদ বর্জোক সামনে খাড়া,
সেজদার সময় থুই কোথায়।"

আবার, কালা শা বলেন,

"কাম-সাগরে জ্বলছে এক সোনা-পুরী,
সেই পুরীতে যাবে যারা,
জেন্তে-মরা হবে তারা।
মরামুখে কিসের বাহাদুরী
ও মন-ব্যাপারী।
... ...
কল্পতরু খবীর[৩] গড়ে,
মুরশিদে বর্জক ধরে—
কাম-সাগরে যাওরে ডঙ্কা মারি।।"

অথবা, পাগল কানাই বলেন,

"আরও বর্জখ ধরে সেজদা কর ভাই
—নইলে নামাজ হবে না।
ও ইস্‌কে-সাদেকে[3] বান্ধহ হে ইমান[4]
বর্জখে রাখ নয়ান।"

'বর্জখ' একটি আরবী শব্দ। আরবীতে এ শব্দটি বাঁধ, ব্যবধান, প্রাচীর, মধ্যবর্তী বা অন্তবর্তী অবস্থা, বিশেষ ভাব বা খেয়াল এবং রমনী আকর্ষণ বা প্রেম প্রভৃতি অর্থে ব্যবহার হয়। মুসলিম ধর্মগ্রন্থ পবিত্র কোরানে এটির ব্যবহার করা হয়েছে তিন বার। তথায় সাধারণভাবে 'বর্জখ' অর্থে স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যবর্তী স্থান বুঝায় এবং প্রতিটি মুসলমান বিশ্বাস করেন যে মৃত্যুর পরে তাঁদের আত্মা শেষ বিচারের দিন (Day of Judment) পর্যন্ত ওই স্থানে অবস্থান করে বা অপেক্ষায় থাকে। কিন্তু এই সাধারণ অর্থের মধ্যে আবার এর গূঢ় তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যাত্মিক অর্থ নিহিত রয়েছে। কোরাণের ব্যাখ্যাতা মুহম্মদ আলীর মতে মানুষের জীবনের তিনটি ভাগ — পার্থিব জীবন, বর্জখে অবস্থানকালীন অন্তবর্তী জীবন, ও (শেষ বিচার-উত্তর) মুক্ত জীবন। কিন্তু সুফিগণ এই বর্জখ' শব্দের মধ্যে আরো গভীর অর্থ নিহিত রয়েছে বলে অনুধাবন করেন। তাঁদের মতে, মনের তিনটি ক্রমউর্ধ্ব' ধাবমান অবস্থার কথাই তথায় বর্নিত হয়েছে।

কোরাণের 'মূমিনূন্' (বা বিশ্বাসীগণ) অধ্যায়ে ব্যক্ত হয়েছে, "যে পর্যন্ত না জাগ্রত হয়, তাদের সামনে রয়েছে বর্জখ।" কৃত্রিম বা কপট বিশ্বাসীদের লক্ষ্য করেই বস্তুতঃ এ উক্তির ব্যবহার। যাঁরা প্রকৃত বিশ্বাসী তাঁদের পার্থিব জীবনেই মুক্তিলাভ হতে পারে, যদি তাঁরা শয়তানের কুচক্র হতে অব্যাহতি লাভ করে কেবল ভগবানেই শরণ নেয়। কিন্তু কপট বিশ্বাসীগণ তাদের প্রার্থনায় কেবল মুখেই বলে, 'তাদের হতে অব্যাহতি লাভের জন্য, হে প্রভু, আমি তোমার শরণ নিই।' এরূপ কৃত্রিম প্রার্থনার মধ্য দিয়েই ক্রমে তাদের জীবন অতিবাহিত হয়ে যখন মৃত্যু ঘনিয়ে আসে তখন তারা কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'হে আমার প্রভু, ফিরিয়ে দাও আমায় সে অমূল্য জীবন যা আমি অবহেলায় নষ্ট করেছি। এখন হতে আমি সৎ-পথে চলব।' কিন্তু এ যে হবার নয়; কারণ, তার এ কাতর প্রার্থনা যে সবই বাহ্য, মোটেই আন্তরিক নয়। তাদের সামনেই রয়েছে 'বর্জখ', যে পর্যন্ত না তারা প্রকৃত ভগবৎ-বিশ্বাসী হয়ে জাগ্রত হয় বা নবজীবন লাভ করে।

কোরাণের 'ফুর্কান' (বা পাপ-পুণ্যের ভেদাভেদ জ্ঞান)-অধ্যায়ে পাই, "তিনিই তোমাদের জন্য দুটি স্রোতধারার মুক্তি দিয়েছেন — একটি স্বাদু ও মধুর এবং অন্যটি লবণাক্ত ও তিক্ত। তথাপি এর মধ্যে একটি 'বর্জখ' খাড়া করেছেন, যা অতিক্রম করা নিষিদ্ধ।" বস্তুতঃ তিনি ছাড়া আর কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। যা কিছু দৃষ্টিপথে লক্ষিত হয়, সব-ই কেবল তাঁরই প্রতীক বা সঙ্কেত। সূর্য ও তার ছায়া, দিবা-রাত্রি, জল-বায়ু এবং প্রকৃতির সকল বস্তু বা বিষয় তাঁরই সঙ্কেত মাত্র এবং প্রতিক্ষণে তিনি কেবল সেই পরম দিব্য-ভাব ও মানব-মনের পাপ-পুণ্যের অন্তর্নিহিত সত্তারই নির্দেশ দিচ্ছেন, কিন্তু আশ্চর্য এই যে (জীব) আত্মা সেই (পরম) আত্মাকে সঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। তার কারণ, আপাত ভেদযুক্ত পাপ-পুণ্যের বা ভালমন্দের বিভেদ যতক্ষণ পর্যন্ত মানব-মনে রয়েছে, ততক্ষণ জীবাত্মা কখনই যুক্তিবাদী মনকে ঠেলে ফেলতে পারে না। অন্যথায় "তিনিই তোমার জন্য রাত্রিকে বসন-রূপে, (তোমার) নিদ্রাটি বিশ্রামলাভের জন্য এবং ঊষাটি শেষবিচারের দিন (বা নবজীবনের প্রতীক)-রূপে সৃষ্টি বা ধার্য করেছেন।" গূঢ়-অর্থে চক্রগতিতে বর্তমান রাত্রি, নিদ্রা ও প্রভাত মানব-জীবনের তিনটি অবস্থা মাত্র—মৃত্যু বর্জখ ও নবজীবন। ঊষা বা প্রভাত-কালের প্রতীক নৌরূজ বা নববর্ষ তত্ত্বকথায় বস্তুতঃ মুক্তিলাভকেই বুঝায়। এই নবজীবন বা অন্তর্জীবন বলতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও মনুষ্যত্বের উপলব্ধিকেই বুঝেছেন। তাঁর 'চারিত্র-পূজা'-য় বলা হয়েছে, "মননের দ্বারা আমরা যে অন্তর্জীবন লাভ করি তাহার মূল লক্ষ্য পরমার্থ। এই আম মহল ও খাস মহলের দুই কর্তা — স্বার্থ ও পরমার্থ। ইহাদের সামঞ্জস্য সাধন করিয়া চলাই মানব জীবনের আদর্শ। কিন্তু মধ্যে মধ্যে সংসারের বিপাকে পড়িয়া যে অবস্থায় 'অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ' তখন পরমর্থেকে রাখিয়া স্বার্থ-ই পরিত্যাজ্য, এবং যাঁহার মনোজীবন প্রবল তিনি অবলীলা ক্রমে সেই কাজ করিয়া থাকেন।"

আবার, 'রহমান' (বা পরম দয়ালু)—অধ্যায়ে বলা হয়েছে, "তিনি দুটি স্রোতধারা সৃজন করেন, যা (অবশেষে) মিলিত হয়। তাদের অন্তবর্তী রয়েছে 'বর্জখ' যা তারা কখনও অতিক্রম করে না।" তিনি পরম দয়ালু বলেই তাঁর দিব্য জ্যোতির দর্শনলাভ আমাদের সম্ভব। কিন্তু সেই অন্তর্জ্যোতিপূর্ণ গূঢ়-রহস্যের সন্ধান-প্রাপ্তি আপাত বিরুদ্ধ-ভাবের সমাবেশ ছাড়া কখনই সম্ভব নয়। তাই তাঁর সৃষ্ট সব-কিছুই যুগল-রূপে প্রকাশিত — আপাত বিরুদ্ধ, কিন্তু অন্তরে সুসমঞ্জস। একজন আরেক জনকে ছাড়া কখনই নিজকে ভোগ করতে পারে না।

কিন্তু পারস্পরিক ভোগ ক্ষণিক। এই ভোগ বস্তুতঃ তিন প্রকারের—প্রাকৃত, মানবিক ও আত্মিক। এ তিন প্রকার ভোগেরই শেষ না হলে তাঁকে বা নিজের পরম সত্তাকে কখনই সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা যায় না। তাই আত্মোপলব্ধি লাভ করেও মুক্ত পুরুষগণ কখনই এই ভালমন্দের বিভেদ অতিক্রম করেন না, যে পর্যন্ত তাঁরা দেহ ধারণ করে থাকেন। তাই কোরাণে উদ্ধৃত হয়েছে, "তোমার প্রভুর কোন্ অনুগ্রহটি তুমি অস্বীকার করবে?—এদের হতেই সৃষ্ট হয়েছে (একদিকে) মুক্তা আর (অন্যদিকে) প্রবাল।" বস্তুতঃ এই দ্বি-ধারারই একটি প্রাকৃত, অন্যটি অধ্যাত্ম।

সাধারণভাবে কোরানের উদ্ধৃত তিনটি শ্লোকেই 'বর্জখ' অর্থে প্রাচীর বা ব্যবধান গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে প্রথমটিতে সাধারণ প্রাকৃত জনের ভগবৎ অস্তিত্বে বিশ্বাস নেই বলে মৃত্যুর পরে বর্জখের সঠিক স্বরূপটি সে জানতে পারে। দ্বিতীয়টিতে যুক্তিবাদী মন ভালমন্দের ব্যবধান দ্বারা অন্তর-স্বরূপটিকে দূরে সরিয়ে রাখে। আর তৃতীয়টিকে আত্মবিশ্বাসীজন উভয় ধারা যে একই উৎস হতে প্রবাহিত হয়েছে বা একই স্থানে মিলিত হয়েছে, তা জানতে পেরে সেই সঙ্গমস্থানে যাঁরা পৌঁছে গিয়েছেন, তাঁদের সন্ধানে নিজকে ব্যাপৃত রাখেন। এই তৃতীয় ব্যবধানের রূপক হিসেবেই গুরু বা মুর্শিদ অর্থে ব্যবহার হয়েছে 'বর্জখ' শব্দ আমাদের বাঙলা বাউল গানে বা মরমিয়া কাব্যে। বস্তুতঃ যিনি ভালমন্দের সঠিক বিচার (বা ফুর্কান) করতে পারেন, তিনিই কেবই আত্মগুরুর সন্ধানে ধাবিত হবেন। সেই ভাবধারাকে লক্ষ্য করেই কোরাণের 'কহফ্' (বা গুহা) অধ্যায়ে আত্মান্বেষী মুসা বলেন, "যে পর্যন্ত না সেই দুই স্রোতধারার সঙ্গমস্থলে পৌঁছি, আমি কেবল ভ্রমণ করেই যেতে থাকব।" কিন্তু অশ্চর্য এই যে তিনি যখন তথায় পৌঁছলেন, পার্থিব সকল চিন্তা হতেই তিনি মুক্তিলাভ করেন এবং গুরু সন্নিধানে এসে তাঁর প্রকৃত সত্তাটি সঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন—যে সত্তার স্বরূপটি বর্ণনার অতীত। সেই তিনটি মনের দরজা (বা অবস্থা) অতিক্রম করে আসতে পারলেই হয় চতুর্থ মার্গের 'তুরীয়' অবস্থা—যার কোন বর্ণনা দেওয়া যায় না। মনের তিনটি দরজার প্রত্যেকটির অন্তর্দেশে যেন একটি করে 'বর্জখ' বা 'খিল' লাগান' রয়েছে, যাকে সরিয়ে বা অতিক্রম করে পরবর্তী অবস্থায় পৌঁছতে হবে। এই 'বর্জখ' অর্থে খিলের ব্যবহার আর একটি বাউল গানে পাই।—

"আপনে সে মুরশিদ হইয়া
জীবকে শিক্ষা দিতেছে,
আপনা ভজন বিতরণ করে'
জীব তরাইবার ফাঁদ পাইতাছে।
মানুষগুরু কল্পতরু মনে যারে খিল পইরাছে,
ফকির লালন বলে, কিসের অভাব তার—
দোজখ তার তরে হারম হইয়াছে।"

এই 'খিল' সংস্কৃত 'কীলক' শব্দেরই অপভ্রংশ মাত্র। সংস্কৃতেও 'কীলক' শব্দ একদিকে যেমন প্রতিবন্ধক বা প্রাচীর অর্থে ব্যবহার হয়, তেমনি আবার এর গূঢ় অর্থ গুরুদেব (বা মহাদেব)-ও হতে পারে। চণ্ডীর 'কীলক'-স্তবই এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কীলকের ন্যায় 'শেল' শব্দও বোধ হয় এই দ্ব্যর্থভাবে সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়েছে। বস্তুতঃ 'শেল'-গুণবিশিষ্ট মহাভারতের 'শল্য' চরিত্র আত্মোপলব্ধির মস্ত প্রতিবন্ধক। অর্জুনের সারথী যেমন শ্রীকৃষ্ণ, তেমনি কর্ণের সারথী 'শল্য'। আবার, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীম আর অর্জুনের হস্তেই সকল প্রধান বীর নিহত হলেও, মহাভারতের আত্মান্বেষী শ্রেষ্ঠ চরিত্র যুধিষ্ঠিরের হস্তেই নিহত হন শল্য। এই শেলের সহিত আবার ইংরেজী shell সম্বন্ধযুক্ত মনে হয়। shell বা খোলস আত্মার আবরণ মাত্র। shell যেমন তার আত্মা বস্তুর প্রতিবন্ধক, তেমনি তার ধারকও।

'শেল'-এর বিকৃত উচ্চারণ রূপে পূর্ববঙ্গে 'হাইল' শব্দের ব্যবহার দৃষ্টি হয়। একই অর্থে এই হাইল বা 'হৈল্' শব্দের ব্যবহার কোরাণেও আছে। 'সবা' সুরা বা অধ্যায়ে পাই, "তাদের ও তাদের বাসনাদির মধ্যে রয়েছে একটি 'হৈল্' (কৃত্রিম ব্যবধান বা প্রতিবন্ধক)।" আত্মোপলব্ধির পথে এই প্রধান কণ্টক হতে যে অব্যাহতি লাভ করতে পারে সেই তো অজর, অমর। এই অমরতা লাভের জন্যই তো বানর-শ্রেষ্ঠ হনুমানকে আনতে হয়েছিল 'বিশল্যকরণী,। রামায়ণের 'বিশল্যকরণী' বস্তুতঃ কোন প্রাকৃত ঔষধ নয়, সকল আত্মভেদের ভাবনা হতে অব্যাহতি লাভের উপায়।

আরবী 'বর্জখ' বাঙলা 'ত্রিবেনী-সঙ্গম'-এর রূপান্তর মাত্র। মনের তিনটি ভাবধারা

সেখানে একত্রে সম্মিলিত হয়েছে, তাই 'ত্রিবেণী-সঙ্গম'। এই ত্রি-ধারা নদীটি রবীন্দ্রনাথের 'রূপ-সাগরে'র নামান্তর। এই রূপ-সাগরের অতলে ডুব দিয়েই অরূপ-সাগরে পাড়ি দিতে হবে। এই রূপ-সাগর বা শ্রীরূপ নদীটির কী সুন্দর বিশ্লেষণ পাই আর একটি বাউল গানে!

"শ্রীরূপ-নদীটি অতি চমৎকার।
তোরে বলি সার, হৃদে কর বিচার,
দেখে ভব-গর্ত হলি মত্ত,
আস্বাদন কি বুঝলি তার॥
বিষম সে ত্রিপানি নদী—
ত্রিকোণ যন্ত্র পাতালভেদী
মধ্যে আছে মহা ঔষধি।
ওঠে ঘুরণো জল, যদি না থাকে গুরুবল,
তবে খুলবে মণিকোঠা ল্যাঠা
সেখানে খুব খবরদার॥
নদীর ভিতর তলায় গরল-সুধা,
এক পাত্রেতে রহে সদা,
সুধা খেলে যায় ভব-ক্ষুধা।
গরল পান করে প্রাণেতে মরে,
ছুটে সেই উল্টো কল নেমেছে ঢল,
শিখতে হবে আপ্ত যার॥
ত্রিপানিতে তিনটি ধারা,
নিধারাতে আছে ধরা,
ঠিক রেখ নয়নের তারা।
পলকে প্রলয়, হয়ে যাবি ক্ষয়,
স্থূলে মূলে সকল ভুলে
করতে হবে হাহাকার॥
বাঁকা নদীর পিছল ঘাটে
যেতে হবে নিষ্কপটে
সাধু বাক্য ধরে এঁটে।

তিন দিন বারুণী, তাইতে স্নান শুনি,
নাইলে সে মহাযোগে অনুরাগে,
কাম-কুম্ভীর কি করবে তার ॥
রসিক ডুবুরী হলে,
ডুব দিয়ে সেই গভীর জলে,
অনায়াসে রত্নধন তোলে।
গোঁসাই গোবিন কয়, কুবীর চাঁদের জয়,
ভেবে গোপাল মূর্খ, পায়রে দুঃখ,
দিনে দেখে অন্ধকার ॥"

আবার, গোঁসাই নরহরি বলেন,

"রূপ - সায়রে তিন - ধারা
বুঝতে পারে রসিক যারা,
সদাই রূপে দেয় পাহারা,
নিরিখ দিয়ে সেই লহর।
প্রথমে গুণেরি মানুষ,
ভক্তি করে রাখ ধরে হুঁশ,
দ্বিতীয়াতে হোস্ না বে-হুঁশ,
নির্বিকারে তাঁরে স্মর।
পূর্ণ-ঈশ্বর উদয় তিনে,
নিষ্কাম যাজন সেই দিনে,
নিরিখ দিয়ে সেইখানে
জোয়ারাতে সন্ধান কর ॥"

মনের এই তিনটি অবস্থা (বা লোক)-কে বেদান্তে বলা হয়েছে ভূ, ভুব, স্ব। সুফী মতে এদের রূপান্তর হলো আলমে-নছুৎ, আলমে-মালকুৎ ও আলমে-লাহুৎ। এই ত্রিলোক বা ত্রি-ধারা প্রাণের বর্ণনা পাই আর একটি বাউল গানে। কবি রশীদ বলেন,

"স্বরূপ - সাগরে ডুবারু যে হয়,
করিয়াছে সে রূপের নির্ণয় ;
... ...
আধ্যাত্মিক জগতে রূপের উৎপত্তি,
স্বরূপ-সাগর সে দেশ লাহুতি,
আধ্যাত্মিক জগৎ আলেম - মালকুত,
এ জড় জগৎ আলমে - নাছুত।"

এই মানব-মনের ত্রি-ধরাকে আবার প্রেমের তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা হয়েছে— সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা। অর্থাৎ, পশু-সুলভ স্বার্থপর কামনা ও বাসনা, মানব-ধর্মী পারস্পরিক আকর্ষণ ও ভালবাসা এবং দেব-দুর্লভ নিঃস্বার্থ প্রেম। বাউল-কবি গোঁসাই রামলাল এই ত্রি-ধারা প্রেমের বিশ্লেষণে গেয়েছেন,

"বিরজার প্রেম-নদীতে যে জন ডুবেছে।
(ওযে) অটল মানুষ-রতন পেয়েছে॥
সাধারণী আর সমঞ্জসা,
সমর্থা প্রেম কুটিল বড়,
নাই তার ভরসা ;
ইহার তিন মানুষের করিলে আশা,
হবে তার নিরাশা।
জেনে লও এক মানুষ বসে আছে॥"

আবার,

"তিন মানুষের খেলা রে মন,
কারে বা কর অন্বেষণ,
তিন মানুষের তিন রূপ করণ,
সদ্‌গুরু, মন, আগে ধর।
জন্মদ্বার আর মৃত্যুর দ্বারে,
আর এক দ্বার আর কইব কারে ;
মৃত্যুর দ্বারে যে জন্মাইতে পারে,
তার সাধন হবে অমর।"

এই 'রূপ-সাগর'-কে অনেক সময় 'ভব-সিন্ধু' বা 'ভব-সাগর'-এর সহিতও তুলনা করা হয়ে থাকে। লালন তথা সুফী কবিদেব ভাষায় তাকে বলে 'আবে-হায়াৎ' বা জীবন-নদী। যেমন,

"আব-হায়াৎ নাম গঙ্গা সে যে,
সংক্ষেপে কেউ দেখ বুঝে,
... ...
জগৎ-জোড়া মীন সেই গাঙে—
খেলছে খেলা পরম রঙ্গে,
লালন বলে জল শুখালে
মীন মিশিবে হাওয়ায়।"

এই 'প্রেম-সাগরে' গুরু-রূপী মনী আপন আনন্দে খেলা করে যায়। সেই গুরুকে কাণ্ডারী করে 'রূপ-সাগরে' পাড়ি দিতে হবে অচিন রতন' পাবার আশায়। এই গুরু-রূপী মীন-ই যে 'বর্জখ' তার বিশ্লেষণ রয়েছে আর একটি বাউল গানে,

"মূল সাধন কর মালেক চিনে।
মীনরূপে সাঁই গভীর জলে,
যোগ-সাধন করো বর্জোক ধ্যানে।
মীন আল্লা নিজ নাম ধরে,
কালামোল্লায়[৪] দেখ জেনে,
আছে নির্মল মহল মণিপুরে,
খেলেছে খেলা ঘাট ত্রিপিনে।[৫]
সে দরিয়ার মাঝে তরী,
হাওয়া বারি আতসপুরী,
কৃপানন্দ আদরিনী
বসে তথা মধুপানে।
মীনের খবর জীব কি জানে,
মীন ধরে অনেক সন্ধানে,
হীরুচাঁদ কয়, ভাব না জেনে
পাঞ্জ[৬] মলি শেউলি টেনে।"

যেমন 'রূপ-সাগরে' পাড়ি দেবার জন্য আবশ্যক কাণ্ডারীর সাহায্য, তেমনি ভব-নদী' পার হবার জন্য চাই মনকে কঠোর সংযমে আবদ্ধ করা। তাই একটি বাউল গানে আছে,

"ভব-সিন্ধু সেতু-বন্ধ করে হওরে পার।
গুরু-উপাসনা ছাড়া পার হওয়া হবে ভার॥
... ...
রেচক, পূরক, স্তম্ভন দিয়ে নদী কর বন্ধন,
প্রেম-ভক্তি খুঁটি তার কর স্থাপন,
... ...
সে নদী অত্যন্ত গভীর, আছে কাম-রূপী কুম্ভীর;
বাঁধলে সাঁকো সে হবে ভেক, গুপ্ত হবে নীর।
সেথায় আছে লোভ-রূপ রাঘব, ক্রোধ-রূপ হাঙ্গর আর॥
সুদৃঢ় শ্রদ্ধা-দড়িতে ধরা বাঁশ বাঁধ তাতে
গোঁসাই রামলাল বলে, রামচন্দ্র যাও ধরে তাতে।"

যেমন হিন্দু-শাস্ত্রে 'সেতু-বন্ধ' তেমনি প্রাচীন পার্শি গ্রন্থে রয়েছে 'চিন্‌বৎ পেরেতু' (বা 'চিন্‌বদ পুল্‌)। 'য়স্ন'-র ৪৬ অধ্যায়ে 'অহুর মজদা'-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, "যে সকল ব্যক্তি সৎ-কার্য ও সৎ-মনন দ্বারা তাদের জীবন অতিবাহিত করেছে, মৃত্যুর পর তাদের সকলকে আমি (অর্থাৎ ভগবান) 'চিন্‌বদ পুলের' উপর দিয়ে চালিত করে আমার নিকট নিয়ে আসব, কিন্তু যারা সকল সময় কেবল অসৎ কর্মে লিপ্ত ছিল, তারা চিরকালের জন্য নরকে অবস্থান করবে।" পার্শিদের যেমন 'চিন্‌বদ পুল', তেমনি আবার বাউল গানে 'পুলে-সিরাতের' উল্লেখ রয়েছে। যেমন,

"ভবপারে যাবিরে অবুঝ মন, আমার মন রে রসনা
দিন থাকিতে মুরশিদ ধরে সাধন ভজন করলে না।
... ...
দেহের বাদী রিপু ছয়জন—আগে বশ কর তারে,
ঐ নাম ভুললি পরে পড়বি ফেরে, প্রাণ যাবে হীরার ধারে,

আবার পুল-সেরাত পার হবি কেমন করে ?
ও দায়মালি চোর, ওরে গাঁজাখোর, আর কত বুঝাব তোরে,
তাই পাগল কানাই কয় ওরে আমার অবুঝ মন রে রসনা॥"

'পুল-সেরাৎ'-এর ন্যায় আবার হিন্দু-শাস্ত্রে 'বৈতরণী'-র খেয়া। বৈতরণীর খেয়া বস্তুতঃ 'রূপ-সাগর' হতে 'অরূপ-সাগরে' পাড়ি দেবার উপায় বা পথ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'খেয়া'-য় এই ভাবধারারই প্রতিধ্বনি রয়েছে বলে মনে হয়। এই 'খেয়া' বা এর কাণ্ডারী 'বর্জখ' প্রকৃতপক্ষে একার্থবোধক।

'বর্জখ-এর আরবী অর্থ পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। ইহা ফারসী 'ফর্সখ' বা 'ফরসন্গ্'-এর সহিত সংশ্লিষ্ট বলে মনে হয়, যার ইংরেজীতে রূপান্তর হয়েছে parasaug 'ফর্সখ্' অর্থে বুঝায় দৈর্ঘ্যের পরিমাপ বা mile-post, কাল-নির্ধারণ, বিরাম, বিশ্রাম, ফাঁড়ি, বা আজীবন স্থায়ী স্রোতধারা। 'ফর্সঙ্' সংস্কৃত 'প্রসঙ্গ' বা গ্রীক parasaqges হতে উদ্ভূত বলে মনে হয়। যেমন চলার পথে রয়েছে **mile-post**, তেমনি জীবন-পথে অথবা মনের অনুশীলনে আসা নানা প্রসঙ্গ। এই প্রসঙ্গের মাধ্যমেই হয় 'পরম' এর সঙ্গলাভ। কিন্তু পার্থিব নানা প্রসঙ্গের আকর্ষণে জড়িয়ে পড়লে সমূহ বিপদ ও অবশেষে মৃত্যু ও বিনাশ। আবার এই প্রসঙ্গই অবসর-বিনোদনের প্রকৃষ্ট আশ্রয়-স্থল। অসীমের যাত্রাপথে সীমার মাধ্যমে 'তাঁর' পরিচয় লাভ করে কেবল আমাদের এগিয়েই চলতে হবে। যুগল-সঙ্গের ধারাবাহিকতা এগিয়ে চলেছে নানা প্রসঙ্গের মাধ্যমে সেই নিঃসঙ্গ বা একক সঙ্গের আশায়। দ্বৈতবোধ বা সঙ্গতার মাধ্যমেই আসবে একাত্মবোধ, কিন্তু 'একের' আবার কি পরিচয় বা 'তত্ত্ব'! তাই তাঁকে জানতে হলে আশ্রয় করতে হয় তাঁর 'তত্ত্ব' স্বরূপ গুরু বা মুর্শিদকে। সেই জন্যই একদিকে 'বর্জখ্' যেমম প্রতিবন্ধক, তেমনি আবার অন্যদিকে পথ-প্রদর্শক। সেইরূপ আমাদের 'অহঙ্কার'। 'অহং'-এরই কার্য ছড়িয়ে রয়েছে বিশ্বময়। 'আমার' কাজ যেদিন তাঁর কাজ বলে জানব, তখনই হবে সঠিক 'সোহহং'-এর উপলব্ধি।

এই 'সোহহং'-ই বস্তুতঃ 'বর্জখ্'-এর রূপক। এই বর্জখের স্বরূপটি সর্দার ইক্‌বাল আলী শাকী সুন্দরভাবে তাঁর Islamic Sufism-এ ব্যাখ্যা করেছেন! "Life offers a scope for ego activity and death is the first

test of the synthetic activity of the ego. Barzakh is a state of conciousness characterized by a change in the ego's attitude towards time and space. It was Helmholtz who first discovered that nervous excitation takes time to reach consciousness. If this is so, over present psychological structure is at the Bottom of our present view of time, and if the ego survives the dissolution of this structure, a change in our attitude towards time and space seems perfactly natural. The enormous condensation of impression which occurs in our dream life, and the exultations of memory which sometimes takes place at the moment of death, disclose the the ego's capacity for different standards of time. The state of Barzakh, therefore, does not seem to be merely a passive state of expectation ; it is a state in which the ego catches a glimpse of fresh aspects of Reality, and prepares himself for readjustment of those aspects."

পদটীকা

১. প্রর্থনা বা প্রণতি

২. পাপ বা অন্যায়

৩. যিনি খবর বা সংবাদ রাখেন

৪. পবিত্র প্রেমে

৫. বিনবাস বা প্রত্যয়

৬. অর্থাৎ পঞ্চ রিপুর সমাবেশে